১ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা,
সপ্তম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৯

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যঃ একটি আলোচনা

আনিসুর রহমান খান*

Cultural Heritage of Bangladesh : A Discussion

Anisur Rahman Khan

Abstract: Sociologically speaking, culture is the way of life and a nation's/society's identity as revealed by it. Bangladesh is said to be the land of composite-culture, and it is embedded in rich cultural heritage. Despite different sects and creeds, the cultural heritage of Bangladesh is engrained in the glamorous exposition of this nation from time immemorial. Without proper preservation and understanding of different elements of cultural heritage- we can not embark on the path to enlightenment. But what is important is that, how much we really understand and feel synthesize towards the elements in search of separate entity as a nation. The aim of this article is to shed light on our origin, evolution, adaptation and above all, to establish a sound platform for our everlasting identity.

ভূমিকা

কোন দেশ বা জাতির পরিচয় ঐ দেশ বা জাতির সাংস্কৃতিক অবয়বের মধ্যে নিহিত। সৃষ্টির শুরু হতে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অগ্রসরের মাধ্যমে কোন দেশ বা জাতি একসময় নিজস্বতা বা স্বকীয়তা অর্জন করে-আর এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিজস্বতা বা স্বকীয়তার প্রকাশ অন্যকথায় তার সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশও বটে । এরই ধারাবাহিকতায় আমরা যদি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় বা আরেকধাপ এগিয়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে চাই, তবে আমাদের সংস্কৃতি প্রত্যয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। শুরুতেই বলে নেয়া প্রয়োজন, যে সংস্কৃতি হচ্ছে এমন একটি প্রত্যয়, যার আলোচনা বহুবিভাজনে বিভক্ত। কেননা কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীরা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোন থেকে সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। যেমন, ঐতিহাসিকরা সংস্কৃতি বলতে এক একটি ঐতিহাসিক পর্বের কৃষ্টি, প্রথা, রীতি-নীতি বা রেওয়াজকে বুঝে থাকেন। সাহিত্যে সংস্কৃতি বলতে মনোজগতের ভাবনা, কল্পনা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি বুঝায়। আর আমরা বেশীরভাগই সংস্কৃতি বলতে গান, চিত্রকলা, নাট্যকলা, শিল্পকলাসহ নানাবিধ

* সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

সাহিত্য কর্মকে বুঝে থাকি। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, এসবই সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান কিন্তু কোন পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ নয়। বরং নৃবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতির ব্যাখ্যা অনেক বেশী বাস্তবসম্মতঃ এবং সর্বউপাদান আবৃত্তকারী। কেননা নৃবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের সামগ্রিক জীবনধারাকে বা সমস্ত সৃষ্টি আর কর্মকে সংস্কৃতি নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ সম্পর্কে বলা যায়, কোন জাতি বা গোষ্ঠীর দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্ম থেকে শুরু করে তার চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশের সম্মিলিত রূপায়ন এবং সেই সাথে সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জিত আচরণবিধিই সংস্কৃতি। আরও সহজে বলতে গেলে শয়নে, বসনে, আহারে, বিহারে অধিকাংশ লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে যার অনুশীলন করে সেটাকেই সংস্কৃতি বলা উচিত। এ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভারের উক্তিটি প্রণিধান যোগ্য, তিনি বলেন,

> "It (culture) is the expression of our nature, in our modes of thinking, in our everyday intercourse, in art, in literature, in religion, in recreation and enjoyment." MacIver and Page, Society: 499

বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা সংস্কৃতির ব্যাখ্যায় 'সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতা' বা Cultural Relativity প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। এর অর্থ হল কোন একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতিকে অন্য সংস্কৃতির সাথে তুলনায় উচ্চ বা নীচু মানে বিচার করা যায় না। প্রত্যেকটি সংস্কৃতিই তার নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে আলাদা এবং অনন্য সাধারণ সকল সমাজেই সংস্কৃতি থাকে এবং আছে। সমাজভেদে সংস্কৃতি শুধু উন্নত, পরিণত বা অপরিণত বা অনুন্নত হতে পারে। সমাজের নিজস্ব কর্ম, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপর সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে। এ বিশ্বাস, কর্ম বা মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে সমাজভেদে সংস্কৃতির ভিন্নময়তা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে মোটা মেয়ে সবচেয়ে বেশী সুন্দরী বলে বিবেচিত। বিয়ের আগে মেয়েদের প্রচুর পরিমাণে খাওয়ানো হয় যাতে সে আরও মোটা হয়। সুন্দরের এ ধারণা আমাদের প্রচলিত ধারণা হতে সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থাৎ, প্রত্যেক সমাজেই তার সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট ধারবাহিকতা ও নিজস্বতা রয়েছে। ফলশ্রুতিতে সংস্কৃতির একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস বা ঐতিহ্য রয়েছে। বর্তমান আলোচনায় আমরা বাংলাদেশের সংস্কৃতির এই নিজস্ব ধারাবহিকতা বা ঐতিহ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করব।

সংস্কৃতির প্রকারভেদ

এই যে দৈনন্দিন কাজকর্ম বা চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশের সম্মিলনে যে সংস্কৃতি তাকে সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানীরা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করেন; (ক) বস্তুগত (Material) বা বাহ্যিক (Explicit) সংস্কৃতি এবং (খ) অবস্তুগত (Immaterial) বা অ-বাহ্যিক (Implicit) সংস্কৃতি। ঘরবাড়ির ধরন, পোষাক পরিচ্ছদের ধরন,

তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, উৎপাদন উপকরণ ইত্যাদি হল বস্তুগত সংস্কৃতি। আর দক্ষতা, জ্ঞান, আচার-বিশ্বাস, ধ্যানধারণা, ভাষা, সংগীত, সাহিত্য, নৃত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি নানাবিধ উপাদান নিয়ে গড়ে উঠে অবস্তুগত সংস্কৃতি -যাকে নন্দনগত এবং ভাবগত উপাদানের সংমিশ্রণও বলা যায়। এক কথায় বস্তুগত এবং অবস্তুগত সংস্কৃতির সম্মিলনেই পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিচয়। কোন সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আলোচনা শুধুমাত্র বস্তুগত বা অবস্তুগত সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে হতে পারে না, বরং এ দুয়ের সমন্বয়েই হবে পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা

এখানে সংস্কৃতির সঙ্গে সভ্যতার সম্পর্কটা কি এ সর্ম্পকে দুই একটি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে এবং তার সাথে ব্যাক্তির সৃজনশীল প্রয়াস দ্বারা সমাজ যে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে - অর্থাৎ যাকে আমরা সভ্যতা বলে অভিহিত করছি, তার সঙ্গে সংস্কৃতিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করব? যদিও সমাজবিজ্ঞানে এ দুটি প্রত্যয়ের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে, কিন্তু উভয়ের সর্ম্পক নিবিড়, ক্ষেত্রবিশেষে একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল। আমরা সংস্কৃতি বিভাজনে বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির কথা বললাম, আর সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বস্তুগত সংস্কৃতির উন্নততর রূপায়নই সভ্যতা এবং বস্তুগত সংস্কৃতির এই উপাদানগুলোর মধ্যে অবশ্যই নিজস্বতা থাকতে হবে। কিন্তু সভ্যতার ক্ষেত্রে নিজস্বতার পাশাপাশি বাইরের সমাজের প্রভাবও থাকতে পারে; যেমন, এদেশের ঐতিহ্যিক বস্তুগত সংস্কৃতির একটি বাহন হল নৌকা, কিন্তু নৌকায় গতিময়তা আনার জন্য ইঞ্জিন ব্যবহৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইঞ্জিনই সভ্যতার প্রতীক। আবার বলা যায়, আগ্রার তাজমহল সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন নামকরা আধুনিক ভবনের চেয়ে মূল্যবান, কেননা তাজমহল সৃষ্টির পিছনে আবেগ আর ভালবাসার প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু ঐসব ভবনসমূহ সভ্যতার ফসল হলেও তাজমহলের মত ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন হয়ত নয়। যাহোক, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এ দুইটি অবশ্যই আলাদা সামাজিক প্রপঞ্চ। মানবজীবনের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ দ্বারা সংস্কৃতি প্রভাবিত, এর সাথে সমাজজীবনের সর্ম্পক একেবারে শিকড়ে গ্রথিত। কিন্তু সভ্যতার ক্ষেত্রে তা নয়, এ খুব সহজে আয়ত্তযোগ্য এবং পরিমাপযোগ্য। তাইত দেখা যায়, বিভিন্ন দেশে অভিন্ন সভ্যতা বিরাজ করলেও জীবনধারাগত পার্থক্য রয়েছে। যেমন, ফরাসীদের খাওয়া-দাওয়া ও চিন্তাধারার সাথে ইংরেজ জাতির যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু এদেশ দুটোর সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন প্রায় অভিন্ন। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে সভ্যতা তাই যতই বস্তুগত সংস্কৃতির এক উন্নততর পর্যায় হোক না কেন, তার সাথে একটি ঐতিহ্যগত, একটি নিজস্ব সৃষ্টিশীলতার সন্ধান থাকতেই হবে। নইলে তা শুধুই সভ্যতা, এর সাথে সংস্কৃতির যোগসূত্রতার সন্ধান নির্ণয় অসম্ভব।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উৎসের সন্ধান

মানুষের কর্মময় জীবনই সংস্কৃতি। কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ যে ঐতিহ্য তৈরি করে তা তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য একটি জাতির পরম সম্পদ। যে জাতি তার ঐতিহ্য লালনে আন্তরিক নয় সে জাতি তার সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারে না। একটি জাতি বা দেশের যাত্রাপথে তার ইতিহাস, ঐতিহ্য বা উত্তারাধিকার সম্পর্কিত চেতনা তাকে সজীব রাখে। বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা উত্তরাধিকার বহতা নদীর মত - তার স্রোতধারার উৎস মূলসম্পদে, পরবর্তীতে বিভিন্ন রূপময়তায় বিকশিত হয়ে প্রবাহিত হয়।

এই যে প্রবাহ তা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রত্যয়ের মাধ্যমে ঘটে; যেমন, সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি (Cultural diffusion), যেখানে পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক লেনদেন বা যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে সংস্কৃতি এক সমাজ হতে অন্য সমাজে ব্যাপ্তি লাভ করে। আর সমাজ হতে সমাজে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি বা প্রসার ঘটার সাথে সাথে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যার নাম সাংস্কৃতায়ন (Acculturation), যার মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন প্রক্রিয়ায় এক সমাজের সংস্কৃতি অন্য সমাজে গৃহীত হয়। এছাড়া সংস্কৃতি তার চলার পথে ধার (Borrowing) বা নবউদ্ভাদন (Innovation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও অগ্রসর হয়। সংস্কৃতি বিশ্লেষণে এগুলো হচ্ছে অপরিহার্য বাস্তবতা।

কোন জাতির বা সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উৎসের সন্ধান করতে গেলে মনে রাখতে হবে সংস্কৃতি প্রাচীনকাল হতে একক কোন প্রবৃত্তিকে বহন করে প্রকাশিত নয়। 'দেব-নেব-রক্ষা করবো' সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এটি মূল্যবান কথা। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতির উপাদানগুলো বারবার পরিবর্তিত বা পরিমার্জিত হয়ে একটা অঞ্চলভিত্তিক, গোষ্ঠীগত বা জাতিগত সাংস্কৃতিকরূপ পরিগ্রহ করে - যা এক সময় বিভিন্ন পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা আবিষ্কার করি। এ ক্ষেত্রে বলা যায় কোন সংস্কৃতি বহির্জগত থেকে ধারণা সংগ্রহ করতে পারে, কিন্তু তার উদ্ভব এবং বিকাশ সম্ভব আপন পরিমন্ডলে। এভাবে সংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সন্ধান সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আরও সহজে বা সংক্ষেপে বলা যায়, সংস্কৃতি যদি পূর্ণাঙ্গ জীবনধারা (way of life) হয়, তবে এই জীবধারার যে উপাদানসমূহ যুগ পরিক্রমায় ঐ জাতি, দেশ বা সমাজের মধ্যে একাত্ম হয়ে আছে এবং যা লালন, সংরক্ষণ বা প্রতিপালনের প্রতি ঐ জাতি বা দেশ সচেষ্ট, আর সর্বোপরি যে জীবনধারার পরিচয়ে সামগ্রিক পরিচয় - তাইতো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মূলত এক ঐতিহাসিক দর্পণ। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিশ্লেষণটি উল্লেখযোগ্য, যার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে উঠে সংস্কৃতি এবং এর ঐতিহ্যগত যোগসূত্রতা, "Culture is a set of guidelines(both explicit and

implicit) which individuals inherit as members of a particular society, and which tells them how to *view* the world, how to experience it *emotionally*, and how to *behave* in it in relation to other people, to supernatural forces or gods, and to the natural environment. It also provides them with a way of transmitting these guidelines to the new generation- by the use of symbols, language, art and ritual. To some extent, culture can be seen as an inherited 'lens', through which individuals percieve and understand the world that they inhabit, and learn how to live within it." (Helman, Health, Culture and Illness : 2-3)

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়ে এই সমাজ, দেশ বা জাতির পরিচয় জানাটা অপরিহার্য জরুরী, কেননা সংস্কৃতি জন-মানুষ বা ভৌগলিক পরিমন্ডলের মধ্যে বিকশিত হয়। এ প্রসঙ্গে বলা চলে এ.কটি কৌমগোষ্টীর নাম হিসাবে 'বঙ্গ' পরিচয় লাভ করে। 'বঙ্গ,' 'গৌড়,' 'পুন্ড্র' ও 'রাঢ়'-এই চারটি কৌম নিয়ে বাংলার জনপথ গঠিত। বর্তমানে বাংলাদেশ বা পূর্ববঙ্গই যে, বঙ্গ কৌমের মূল আবাসভূমি এ ক্ষেত্রে পন্ডিতরা একমত। এদেশে যাদর আদিবাস ছিল তারা প্রাক দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক, যারা অষ্ট্রিক ভাষাভাষী নামে পরিচিত। পরবর্তীতে দ্রাবিড় ভাষাভাষী, আর্য, মঙ্গোলীয়, ইত্যাদি নানাবর্ণের আগমনের ফলে বর্তমানে শংকর জনগোষ্ঠী নামেই এদেশবাসীর পরিচয়। জাতিগত পরিচয়ের মত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংস্কৃতির উপাদানগুলো বিচিত্র পালাবদলের মাধ্যমে এগিয়ে গড়ে উঠেছে এমন সংস্কৃতি- যাকে বলা চলে শংকর জনগোষ্ঠীর শংকর সংস্কৃতি।

বর্তমানে তাই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় composite-culture বা বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়রুপে। কেননা এদেশকে বাঙ্গালী অধ্যুষিত মনে হলেও, এখানে আছে বিভিন্ন উপজাতি, নৃগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত এক বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে তেমনি আছে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ধর্মের অনুসারীদের দ্বারা সৃজন বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি। সীমিত পরিসরে হলেও আছে অঞ্চলভিত্তিক সাংস্কৃতিক বাস্তবতা। এর আলোকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচার করে বলা যায় এদেশে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদয়ের মধ্যে হাজার বছরের সহঅবস্থান রয়েছে। যদিও ৮ম-৯ম শতক হতে ধীরে ধীরে মুসলমানদের আগমনের ফলে ইসলাম সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু হয়েছিল; কিন্তু মূলকথা হল, ইসলাম এদেশে স্থানীয়ভাবে অভিযোজিত হয়েছে । ফলশ্রুতিতে, এই অভিযোজন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বাদ পড়েনি হাজার বছরের সামাজিক ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও চেতনা। অর্থাৎ নানা উৎসের দানে এবং প্রভাবে বাংলাদেশের সংস্কৃতি নানাভাবে প্রভাবিত হবার পাশাপাশি বিভিন্ন বৈচিত্রতার মধ্যেও এদেশের সংস্কৃতি

একটি সর্বজনীনরূপ পরিগ্রহ করেছে-যা আবহমান বাংলার সংস্কৃতি নামে পরিচিত। বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল জাতিগোষ্ঠী এবং সম্প্রদায় কেউ পুরোপরি বা কেউ সীমিত পরিসরে হলেও এই সর্বজনীন সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আলোচনায় এই সর্বজনীন সংস্কৃতির রূপটিই তুলে ধরার চেষ্টা করা উচিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের আলোচনা খুবই জরুরী বলে মনে হয়;

প্রথমতঃ বাংলাদেশের মূল বা সর্বজনীন সংস্কৃতির স্রোতের সঙ্গে উপজাতীয় গোষ্ঠীর সমন্বয় কতখানি, এবং তাদের সংস্কৃতিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে?

দ্বিতীয়তঃ মূল সংস্কৃতির সঙ্গে লোক সংস্কৃতির সম্পর্ক কি, এবং তা কিভাবে বিশ্লেষণ করা হবে?

তৃতীয়তঃ নগর সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তার সংগে এই সর্বজনীন মূল সংস্কৃতির একাত্মতা কোথায়?

প্রথম প্রশ্নের মীমাংসায় বলা যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠীর সংগে সাধারণ বাঙ্গালী সমাজের মূল পার্থক্য সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতায়। কারণ প্রতিটি উপজাতির একটি নিজস্ব জীবনধারা বা সাংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে - উপজাতি সমাজের ভাষা, ধর্ম, পরিবার ব্যবস্থা, সামাজিক জীবন সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই মাটিতে সহাবস্থানের মাধ্যমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় উপজাতীয় সমাজের মধ্যে মূল সংস্কৃতির যে উপাদান প্রবেশ করে নি একথা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। এটা এক প্রকার সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার ফল। তবে বর্তমান আলোচনা বিভিন্ন উপজাতি সংস্কৃতির পরিব্যাপ্তির বাইরে থাকবে, যেহেতু এসব আলোচনা বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের দাবী রাখে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি খুবই মৌলিক। যুগ যুগ ধরে নিরক্ষর জনসমাজের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে যে সংস্কৃতি তাকেই লোক সংস্কৃতি নামে আখ্যা দেয়া হয়। আর বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ লোক সংস্কৃতির ভান্ডার, তাই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং লোক ঐতিহ্য অভিন্ন কিছু নয়, বরং একটি অন্যটির সম্পূরক বা পরিপূরক। সুতরাং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আলোচনায় লোক সংস্কৃতির উপাদানগুলো ঘুরে ফিরে আসবে এটাই স্বাভাবিক। আর বেশীরভাগ ক্ষেত্রে লোক সংস্কৃতির উপাদান দ্বারাই পরিবর্তিত ও বিকশিত বাংলার সংস্কৃতি।

আর সবশেষে নগর সংস্কৃতির আলোচনায় সোজা কথায় বলা যেতে পারে, কলকাতা ব্যাতীত সাধারণভাবে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে এবং বিশেষভাবে আজকের বাংলাদেশে তার প্রভাব উল্লেখ করার মত কিছু ছিল না। কিন্তু এ কথা বলা ঠিক

যে, আমরা এখনও প্রায় ঐ অবস্থাতেই আছি। অর্থাৎ আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আলোচনায় নগর সংস্কৃতির তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই। কেননা যে দেশের ৮৫ ভাগ লোক পল্লীতে বসবাস করে, সেদেশের সংস্কৃতির পরিচয় অবশ্যই পল্লী জীবন কেন্দ্রিক। নগর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এদেশের সাংস্কৃতিক রূপান্তরটা ছিল এরূপ 'নিজের যা ভাল তা রেখে দাও, অপরের যা ভাল তা গ্রহণ কর।' তাইত ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেও বাংগালী ধূতি, চাদর, পাঞ্জাবী ছাড়ে নি, আজও পহেলা বৈশাখকে ভুলে নি। আর এর ফলে আমরা হয়ত কিছুটা বেঁচে গেলাম, আর কিছুটা বেঁচে গেল আমাদের সংস্কৃতি।

ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির প্রকাশ

আগেই বলা হয়েছে সংস্কৃতি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনধারা, তবে এর প্রভাব বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। নিম্নে কিছু উপকরণের (বস্তুগত ও অবস্তুগত) মাধ্যমে বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশ দেখানো যেতে পারে। আর এর দ্বারা পাওয়া যেতে পারে আমাদের উৎস এবং চেতনার সন্ধান।

১. উৎপাদন ব্যবস্থা

কোন সমাজের সাংস্কৃতিক পরিচয় তার উৎপাদন ব্যবস্থার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। প্রাচীন কৌম সমাজে আমাদের পূর্বপুরুষরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করত, এটি ছিল শিকার (Hunting) এবং সংগ্রহমূলক (Gathering) সমাজ ব্যবস্থা। পরবর্তীতে অষ্ট্রিক ভাষাভাষীদের দ্বারা যে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন হল, তা থেকে আমরা আজও বের হতে পারিনি। জোয়াল, লাঙ্গল, আর বলদ এখনো আমাদের উৎপাদনের মাধ্যম। সবচেয়ে বড় কথা হল, এই কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে এদেশে একটি স্থায়ী সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আর যার উপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়েছে অন্যান্য সকল উপাদান।

২. যাতায়াত ব্যবস্থা

সুপ্রাচীন কাল হতে গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, হাতি, পালকি, নৌকা ইত্যাদি ছিল যানবাহন। যদিও বর্তমানে পালকি, ঘোড়ার গাড়ী, এমনকি গরুর গাড়ীর ব্যবহার বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলা যায়, কিন্তু এই কিছুদিন আগ পর্যন্ত গ্রামবাংলায় পালকি ছাড়া কনে পরিবহন হচ্ছে ভাবা যেত না। তবে উল্লেখ্য, ঐতিহ্যগত উপকরণ হিসাবে নৌকা এখনও আমাদের প্রধান বাহন হিসেবে ব্যবহৃত। আর এসব যানবাহনগুলোর ও রয়েছে নিজস্ব অনন্য সাধারণ আঙ্গিক।

৩. খাদ্যাভ্যাস

মাছ-ভাত না হলে বাঙ্গালীর চলে না, মাছ-ভাত বাঙ্গালীর প্রধান আহার্য্য। মেছোবাঙ্গালী ও ভেতোবাঙ্গালী আখ্যা পাবার প্রধান কারণ, সুপ্রাচীন কাল হতেই

অসংখ্য নদনদী অধ্যুষিত এ দেশে প্রচুরমাছ এবং প্রধান কৃষিপণ্য হিসাবে ধানের জন্যই ভাত হয়ে গেছে প্রধান খাদ্যবস্তু। কৃষির আবিষ্কার ফলে বিভিন্ন ফল ও তরিতরকারীও বাঙ্গালীর খাদ্যের অংশ। যেমন, অষ্ট্রিকভাষী লোকেরা কলা, লাউ, বেগুন, কুমড়ো, ঝিঙ্গে, কামরাঙ্গা, সুপারি ইত্যাদি চাষ করত-প্রমাণস্বরূপ বলা যায় ইত্যাদি শব্দ অষ্ট্রিকভাষা হতে এসেছে। তাছাড়া মাছের মত এতটা না হলেও মাংসের প্রতিও বাঙ্গালী অনুরক্ত। মোঘল প্রভাবে আজ বাঙ্গালীর উৎসবের খাদ্য পোলাও, কোর্মা, কালিয়া ইত্যাদি। তাছাড়া বাঙ্গালী শুধু মাছ-মাংসই খায় না, বিভিন্ন অঞ্চলভেদে পিঠাপুলি ও মিষ্টান্ন স্বতন্ত্র বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত। বাঙ্গালী যে অতিমাত্রায় রসনারসিক জাতি তা বিভিন্ন পরিব্রাজকের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। সর্বোপরি ধর্মীয় বিধানে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ কয়েকটি দ্রব্য ব্যাতীত ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর খাদ্য তালিকা ও পাকপ্রণালী প্রায় অভিন্ন।

৪. বসন-ভূষণ

প্রাচীনকাল হতেই মেয়ে-পুরুষ সবাই সেলাই ছাড়া কাপড় ব্যবহার করত, যদিও সেলাই করা কাপড়ের প্রচলন হয়েছে অনেক পরে। মেয়েদের শাড়ী এবং হিন্দুদের ধুতি (যা এক সময় মুসলমানরাও পরিধান করত) ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তা আজও টিকে আছে। বর্তমানে লুঙ্গি ধুতির স্থান গ্রহণ করেছে। তাছাড়া মুসলিম আগমনের ফলে পাজামা, পাঞ্জাবী আমাদের বসনের অংশ হয়ে গেছে। সবসময় লম্বা চুল রাখার রীতি প্রচলিত ছিল, যা মেয়েদের মধ্যে এখনও চালু। পাদুকার মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল কাঠের খড়ম, তাছাড়া লাঠি এবং ছাতা, যা সাধারণভাবে বাঙ্গালীরা ব্যবহার করত। একটা সময় ছিল যখন নারী পুরষ সবাই একই ধরনের অলংকার পরিধান করত। কানে, কুণ্ডল, গলায় মুক্তার মালা, হাতে বালা, মহিলারা শঙ্খ, চুড়ি ও পায়ে নুপুর পড়ত। সোনা-রুপার ব্যবহার সবসময় সমাজে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে ছিল। শাড়ী, সোনা, রুপা ছাড়া আমরা আজও কোন বাঙ্গালী ললনাকে কল্পনা করতে পারি না।

৫. প্রসাধন

এক সময় মেয়েরা চন্দনগুঁড়ো, মৃগনাভি আর জাফরান দিয়ে দেহ প্রসাধন করত। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত এসব প্রসাধন দুষ্প্রাপ্য হলেও সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত কপালের সিঁদুর, কাজলের টিপ, আলতা মাখা পা, রঞ্জিত ওষ্ঠ, হাতে মেহেদীর আলপনা আজও বাঙ্গালী রমনীদের সৌন্দর্য প্রকাশের ঐতিহ্যগত মাধ্যম।

৬. স্থাপত্যকীর্তি

আজকের মত সেকালেও গ্রামাঞ্চলে ঘরবাড়ি তৈরি হত মাটি, বাঁশ কাঠ-খড় দিয়ে। পাথরের স্বল্পতার কারণে রাজপ্রসাদ থেকে শুরু করে মসজিদ, মন্দির, বিহার

সবকিছুতেই ইটের প্রাধান্য। আর সেজন্যই এদেশের স্থাপত্য নির্দশন খুব বেশি টিকে নি। গ্রামবাংলার কুঁড়ে তৈরির রীতিই বিশিষ্ট স্থাপত্যরীতি। চৌকানো ভিতের উপর বাঁশ বা কাঠের খুঁটি ঘিরে বাঁশের চাচারি বা মাটির দেয়াল, তার উপর খড় বা ছনে ছাওয়া ধনুকাকৃতি চাল- বাংলার কুঁড়ে ঘরের এই হল বৈশিষ্ট্য। এ হতে আমরা আজও বের হতে পারি নি। বাড়ীর পিছনে বাঁশঝাড়, আম, জাম, সুপারিসহ বিভিন্ন ফলের গাছ, সামনে পুকুর, পাড়া ছাড়িয়ে চাষের ক্ষেত - এইত আমাদের সুপ্রাচীনকালের স্থাপত্য, আমাদের নিজস্বতা।

৭. **শিল্পকলা**

শিল্পকলা মননের ব্যাপার, হয়ত প্রয়োজনের দিকটিও এতে কম নয়। এই সেদিন পর্যন্ত কৃষি ব্যাতীত গ্রামবাংলার সম্বৃদ্ধির উৎস ছিল নানা রকম শিল্প। গ্রামের লোকদের দৈনন্দিন ব্যাবহারের বিভিন্ন সামগ্রী ও পালাপর্বনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ গ্রামের শিল্পীরাই তৈরি করত। প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ ছাড়াও তারা তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যকে শৈল্পিক রূপায়ন দেবার চেষ্টা করেছে। ফলে অঞ্চলভেদে বা গোত্রভেদে একটা আলাদা বিশেষায়ন গড়ে উঠেছিল। ঢাকাই মসলিন বা শঙ্খশিল্প, সিলেটের গজদন্ত বা বেতশিল্প, রাজশাহীর রেশমশিল্প, পাবনা-টাংগাইলের বস্ত্রশিল্প, চট্টগ্রামের নৌ ও দারুশিল্প সহ বাংলার কাঁথা, শিকা, আল্পনা, কাঁসা-পিতলের দ্রব্য, কূলা, কাঠ বা খোদাইয়ের কাজ, পটশিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি সবই বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আর এসবই আমাদের ঐতিহ্যগত শৈল্পিক স্বকীয়তার নিদর্শন।

৮. **ধর্ম-দর্শন**

ধর্ম সংস্কৃতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আর এদেশে এই উপাদানটিই সবচেয়ে বেশী বির্বতিত হয়েছে। বিবর্তনের ধারায় যেসব নব নব ধর্মবিশ্বাস বাংলার মাটিতে এসেছে সেগুলোকে এদেশবাসী তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিয়েছে। নতুনের সঙ্গে প্রাচীনকে মিলিয়ে এক অপূর্ব Synthesis তৈরি করা হয়েছে। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সবাই মিলে এক Integrated বাংগালী সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। এখানে তাই লালন বলতে পারেন, 'পৈতা দিয়েত ব্রাহ্মণকে চিনলাম, কিন্তু বামনীকে চিনব কিভাবে?' চন্ডিদাস তাই লিখতে পারেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' নজরুল তাই গাইতে পারেন সাম্যবাদের গান। এখানে ধর্মীয় উৎসব সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় উৎসব ও বটে। ঈদ, দূর্গাপূজা, মহররম, বড়দিন, বুদ্ধপূর্ণিমা এ জাতীয় বড় বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে সকল ধর্মমতের অংশগ্রহণ বাংলার কালচারকে অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র বানিয়েছে।

অন্যদিকে এদেশের প্রধান ধর্মগুলোর দার্শনিক ভিত্তি বিবেচনায় দেখা যায়;

ক) ময়নামতি, পাহাড়পুর, মহাস্তানগড় প্রভৃতি প্রাচীন জ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমিতে বৌদ্ধ সংস্কৃতির যে পরিচয়, তাতে আছে এক শংকর ধর্মবোধের উপস্থিতি। তবে উল্লেখ্য, ঐসব স্থানে বাংগালীর শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন রয়েছে তা বাংলাদেশের ঐতিহ্যের আদি উৎস। বৌদ্ধ ধর্মের সাথে জড়িত আছে তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি, বুদ্ধদেবও তার পাশাপাশি আছেন। বৌদ্ধ ধর্ম সাম্যবাদী ধর্ম রূপে গৃহীত হলেও বাংলার তান্ত্রিকতাও এর সাথে যুক্ত।

খ) হিন্দু সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, এটি বর্ণ-শ্রমভিত্তিক ধর্ম। এই সমাজের ধর্মবিশ্বাসের লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে দেবী প্রাধান্য। দূর্গা, কালী থেকে শুরু করে এই তালিকাটি দীর্ঘ। উত্তর ভারতের অন্যান্য জায়গায় সাথে এ ব্যাপারে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের পার্থক্য রয়েছে। ধারণা করা হয় এর পিছনে আছে কৃষিভিত্তিক কৌমসমাজের মাতৃতন্ত্রের ছাপ।

গ) প্রধানতঃ সুফী, দরবেশ শ্রেণীর লোকদের দ্বারাই এ দেশে ইসলাম প্রচারিত হয়। তাঁরা বিভিন্ন দর্শন ও ধর্মমতের সংগে পরিচিত ছিলেন, নানাবিধ তরিকায় বিভক্ত ছিলেন এবং কেরামতির অধিকারী ছিলেন। পীর-মুরীদি প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে তারা প্রেম-ভক্তিবাদ ও গুরুশিষ্যবাদ প্রচার করেছিলেন। অর্থাৎ মুল উৎপত্তিস্থল থেকে ইসলাম অনেক পরিবর্তিত রূপে এসেছিল, তবে ইসলামী দর্শনের মূল সাম্যবাদ বা মানবতাবাদ- যা এদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই হিন্দু, বৌদ্ধ অনেক আচার আচরণ এর সঙ্গে মিশে এক স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিকরূপ পরিগ্রহ করেছে। ইসলাম পরবর্তী বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সাধারণ মানুষের মধ্যে ভক্তিবাদ সর্বব্যাপী শক্তিরূপে বিদ্যমান।

৯. সামাজিক জীবন

সামাজিক জীব হিসেবে এবং সমাজের সদস্যরূপে মানুষের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে সংস্কৃতি মূর্ত হয়ে উঠে। ঐতিহ্যবাহী এই সমাজের প্রাণকেন্দ্র হল পরিবার, পরিবারই আমাদের প্রধান প্রতিষ্ঠান। যুগ যুগ ধরে পারিবারিক বন্ধন ও আদর্শের প্রতি আমাদের অবিচল আস্থা। পরিবারই সামাজিকীকরণ এবং সমাজ নিয়ন্ত্রণে প্রধান ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে সুপ্রাচীন কাল হতে এদেশের মানুষ একধরণের সম্প্রদায়গত মনমানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামই যেন এক একটি সম্প্রদায়। পারিবারিক বিষয়, সম্পত্তির বন্টন, ঝগড়া বিবাদসহ বিভিন্ন সালিশ গ্রামীণ সম্প্রদায়ই করে থাকে।

এদেশের সামাজিক জীবনের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী সংস্কৃতির আরও নির্দশন চোখে পড়ে; যেমন, বাঙ্গালীর আতিথেয়তা, সরলতা, সহনশীলতা, বিভিন্ন উৎসব-উদযাপন প্রিয়তা ইত্যাদি। তাছাড়া এদেশের সমাজ জীবন থেকে প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক কৌমসমাজের স্মৃতি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। মামা বাড়িতে ভাগ্নের অধিকার, হিন্দুর বিয়েতে সম্প্রদানের ব্যাপারে মামার অধিকার, বিভিন্ন ব্রত অনুষ্ঠানে মেয়েদের ভূমিকা বা সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার এর নিদর্শন। অন্যদিকে বিয়ে থেকে শুরু করে বিভিন্ন লোকাচার বা ধর্মানুষ্ঠানের সাথে সম্প্রদায় নির্বিশেষে ধানের গুচ্ছ, কলা, হলুদ, পান, সুপারির ব্যবহার আজও কৃষিভিত্তিক কৌমসমাজের স্মৃতিকে বহন করছে।

১০. বিশ্বাস, সংস্কার, আচার

এদেশের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায় কিছু বিশ্বাস, সংস্কার বা আচার মেনে চলে। এই বিশ্বাস, সংস্কার এবং আচারগুলোর কিছু অংশ নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা যায়, আর কিছু অংশ সমন্বিত সম্প্রীতির উদাহরণ। যুগ যুগ ধরে পালনের মাধ্যমে এগুলো আমাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। আর এসব বিশ্বাস এবং আচরণগুলোর প্রভাব আমাদের সমাজে অত্যন্ত বেশী। কিছু উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়; আজও এখানকার হিন্দু-মুসলমান প্রায় সবাই দৈব গণনায় বিশ্বাস করে, বিয়েশাদী, গৃহনির্মাণ বা কোথাও যাত্রার সময় দিনক্ষণের বিচার করা হয়। হিন্দু কবিরাজ ঠাকুরের নিকট মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন আরোগ্য লাভের জন্য যায়, অন্যদিকে আরোগ্য বা অভিষ্ট লাভের জন্য পীর আউলিয়ার দরবারে হিন্দু-মুসলিম সবাই প্রার্থনা এবং মানত করে। আপদ বিপদ হতে মুক্তি লাভের জন্য অমূল্য মনে করে এদের দেয়া মাদুলী, পানিপড়া, চালপড়া, তেলপড়া ইত্যাদির উপর। অশুভ দৃষ্টির প্রভাব মুক্ত হবার জন্য কালো হাঁড়ির গায়ে সাদা রংয়ের ক্রশ বা চিহ্ন একে লটকিয়ে দেয় বাঁশের খুটির মাথায়। এই সেদিন পর্যন্ত মহামারীর সময় শীতলা দেবী, ওলা বিবিকে সন্তুষ্টু রাখতে ব্যস্ত ছিল সাধারণ মানুষ।

জীবনের বিভিন্ন ক্রান্তীকালীন উত্তরণ অনুষ্ঠানে (Rites of passage & rites of transition) আমাদের সমাজে পালন করা হয় বিচিত্র আচার। যেমন, সন্তান-জন্ম, বিয়ে বা মৃত্যুর সময় এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হয়। তাছাড়া হাতেখড়ি, মুখেভাত, বিয়ের সময় গায়ে-হলুদ, শুভদৃষ্টি, ধানদূর্বা দিয়ে বধুবরণ- এ সবই সমন্বিত সংস্কৃতির প্রকাশ। কৃষি, ঋতু ও শস্য বিষয়ক উৎসব এবং আচারগুলি যেমন, ব্রত, নবান্ন, বর্ষাবরণ, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতির উৎস সুপ্রাচীনকালের

মানুষের ধ্যানধারণা, সংস্কার-বিশ্বাস এবং আজও এসবের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি।

১১. রাজনীতি

রাজনৈতিক চেতনাও সংস্কৃতির বাইরে নয়। ঐতিহাসিক কাল হতে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সচেতন, গণতন্ত্রমনা এবং স্বাধীনচেতা। তাইতো যুগ যুগ ধরে এ অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র এবং বাংলা ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ইংরেজ অধিকারের পর প্রধান প্রধান আন্দোলনগুলো এখান হতেই শুরু হয়েছিল। ফরায়েজী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন এক্ষেত্রে উল্লেখ্য- আর এসব ধারাবাহিকতার ফলাফল হল আজকের বাংলাদেশ। অর্থাৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনচেতা এবং গণতন্ত্রমনা মানসিকতাই আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ঠিকানা।

১২. ভাষা ও সাহিত্য

ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে কোন অঞ্চল বা জাতির সাংস্কৃতিক পরিশীলতার সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটে উঠে। 'চর্যাপদ' বাংলা ভাষার শৈশবকাল, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' তা কৈশরে পদার্পণ করেছে এবং শাহমুহাম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা'য় তা যৌবনমুখ হয়েছে। অতঃপর 'মনসামঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল', 'চন্ডীমঙ্গল', 'রামায়ন', 'মহাভারতে' বাংলাভাষার যৌবনপ্রাপ্তি হয়েছে। অন্যদিকে 'গাজীর গান', 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র মত কাহিনী কাব্য বা রূপকাহিনী (যেমনঃ ঠাকুমা'র ঝুলি) ইত্যাদি দ্বারা বাংলা সাহিত্য নেমে এসেছে রাজদরবার ছেড়ে পর্ণ কুটিরে, হাটে, মাঠে, পথে-সাধারণ মানুষের মাঝে। ভাষা ও সাহিত্যের এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠা করতে বাঙ্গালী জাতি বুকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিতেও পিছপা হয় নি।

১৩. সংগীত

নদীর দেশ বাংলাদেশ, গানের দেশ বাংলাদেশ। আমাদের ঐতিহ্যগত সংগীতের ভিত্তি পল্লী। পল্লী মানুষের প্রাণের কথা, মনের কথা, হৃদয়ের আকুলতা পল্লীগানে অপরূপ রূপে প্রতিফলিত। আমাদের দেশজ সংগীতগুলো মণিখচিত রত্নবিশেষ। এর তালিকা অতিদীর্ঘ, যার প্রত্যেকটি বিস্তৃত আলোচনার দাবী রাখে। শুধু বলা যায় বাউল, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, জারী, সারী, মুর্শেদী, পালাগান, কীর্তন, রাখালিয়া, মারফতীসহ নানাবিধ সংগীত, যা এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে অনন্য মর্যাদায় আসীন।

১৪. নৃত্য

লৌকিক ও সামাজিক নাচগানে বাস্তব জীবনের প্রেম-ভালবাসা, আনন্দ-উল্লাস ও আমোদস্ফূর্তি প্রকাশ পায়। হিন্দু-মুসলিম কৃষক সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একসময় নাচের খুব প্রচলন ছিল। সাধারণতঃ ঐতিহ্যগত নৃত্যবলতে আমাদের দৃষ্টি চলে যায় বিভিন্ন উপজাতীয় নৃত্যের প্রতি। মনিপুরী নৃত্য এবং সাওতালদের ঝুমুর নৃত্য এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালী সমাজে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নৃত্যের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবকে কেন্দ্র করে এদেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যগত নৃত্য হচ্ছে, গাজননৃত্য, ব্রতনৃত্য, পুতুল নাচ, মইথারাণীর নাচসহ নানাবিধ অঞ্চলভিত্তিক নাচ।

১৫. চিত্রকলা

আমদের ঐতিহ্যগত চিত্রশিল্প মুলতঃ পুঁথিচিত্র ও পটচিত্র, তাছাড়া লক্ষ্মীর সারাচিত্রও এর অন্তর্ভুক্ত। আর আছে সখেরহাঁড়ি এবং কলসিচিত্র। আমাদের চিত্রশিল্পের ঐতিহ্যটি লোকশিল্পকলার বিভিন্ন উপকরণের মাঝে মূর্ত হয়ে উঠে। সমাজ জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ, গার্হস্থ্য ও কর্মময় জীবনের প্রতিচ্ছবি এদেশের শিল্পীদের তুলিতে সবসময় মূর্ত হয়ে উঠেছে-আর এর মাধ্যমে আমরা খুঁজে পাই আমাদের শেকড়ের সন্ধান।

১৬. খেলাধুলা

বাংলার খেলার মধ্যেও নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। গোল্লাছুট, ছাউসি, হাডুডু বা দাড়িয়াবাধা, নৌকাবাইচ, মোড়গলড়াই, ষাঁড়লড়াই, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি এদেশের নানাবিধ নিজস্ব খেলা। আর এসব খেলার সাথে জড়িয়ে আছে অতীত ইতিহাস, উৎসব, আচার-অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন জাতির সহাবস্থান বা ভাবের আদান প্রদানের অলিখিত ইতিহাসের যোগসূত্র।

ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি এবং বর্তমান বাংলাদেশ

একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, আজ বাংলাদেশ তার নিজস্বতা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। এর কিছুটা ঐচ্ছিক, কিছুটা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া এবং বাকিটা বিশ্বায়নের ফল। আমাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে আজ ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলোর অনেক কিছুই হারিয়ে যেতে বসেছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক লেনদেন থাকবেই, যা অস্বীকার করার নয়, কিন্তু তার সাথে আবশ্যিকভাবে নীতি-নৈতিকতার একটি সম্পর্ক রয়েছে। নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী তাদের নৈতিকতার মানদন্ডে আচরণসমূহ নির্ধারণ করে থাকে বিধায় সংস্কৃতির একটি বিশেষ নিদিষ্ট রূপ রয়েছে। আর এ থেকে দূরে সরে যাবার অর্থই হল মানবিক মূল্যবোধের

পশ্চাদমুখিতা। মনোজগত এর সমৃদ্ধি সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হবেই, অর্থাৎ যা কিছু সুন্দর, কল্যাণকর এবং বাস্তব তা গ্রহণে সংস্কৃতি শুধু বিকশিতই হতে পারে। কিন্তু আমদের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির নিজস্ব ধারাটি কি অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে না? অর্থাৎ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে নীতি ও নৈতিকতার সম্পর্ক আছে তা থেকে আজ আমরা অনেক দূর- এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আমাদের জনগোষ্ঠীর মনোজগত, মূল্যবোধ, তথা সংস্কৃতি ভাবনা সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দরকার তার অভাব দেখা যাচ্ছে। নেতৃত্বস্থানীয় পর্যায় থেকে নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাকে বেগবান করার চেষ্টা অব্যাহত না রেখে বরং ক্ষেত্র বিশেষে তাকে পশ্চাৎমুখী করার প্রবনতা দেখা যাচ্ছে। আমাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির ধারাবহিকতা, এক কথায় আমাদের নিজস্বতা ও স্বকীয়তা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। আজকে আমাদের সংস্কৃতিকে সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আঘাত করা হচ্ছে, সংস্কৃতিতে আনা হচ্ছে শ্রেণীবোধ, ভাষাকে করা হচ্ছে অবজ্ঞা-যা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বলতে দ্বিধা নেই, শহুরে তথাকথিত বিদগ্ধজনেরা সংস্কৃতির এই দুঃখজনক পরিণতির জন্য অনেকক্ষেত্রেই দায়ী। তাঁরা তাঁদের জীবনযাত্রায় বাঙ্গালীয়ানা প্রভাব মুছে ফেলতে চান এবং পরবর্তী প্রজন্মের উপরও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে। পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে সামগ্রিক জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির নিদর্শন কতটুকু দেখা যায়, তা নিয়ে বির্তকের অবকাশ রয়েছে। শুধু মাত্র বিশেষ কয়েকটি উৎসব উদযাপন অনুষ্ঠানের মধ্যেই আজ বাংগালী সংস্কৃতির মেরুকরণ হয়েছে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশই, যেমন নরওয়ে, তাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত এবং তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে উচ্চে তুলে ধরা ও রক্ষা করার জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, এই ভারাক্রান্ত আলোচনায় না গিয়ে শুধু বলা যায় বর্তমান বাংলাদেশে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির যে ক্ষীয়মান নিদর্শন লক্ষণীয় তা যেন হারিয়ে না যায় এবং সর্বোপরি সেটা রক্ষা করার চেষ্টাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় সংস্কৃতি প্রত্যয়টির তাত্ত্বিক অবয়ব এবং এর বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি সাধারণ রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূলে ছিল এক অনন্য সাধারণ ঐক্যবোধ- ধর্মীয় ব্যবধান এ ক্ষেত্রে কোনদিনই তেমন কোন বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে নি, এবং পারবেও না। ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমেই মূর্ত হয়ে উঠে একটি জাতি বা সমাজের পরিচয়। বর্তমানে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে

আমরা যতই এগিয়ে যাই না কেন-আমাদের পরিচয় কিন্তু আমাদের মূলে, আমাদের নিজস্বতায়। সকলের তাই চেষ্টা করা উচিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কিভাবে রক্ষা করা যায়। সরকার, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলকে এই ঐতিহাসিক সত্যটি উপলব্ধি করে সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসা উচিত। আমরা যদি ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক উপাদনাগুলোকে রক্ষা করতে না পারি, তবে জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে আমাদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। পরিশেষে বলা যায়, সমাজ রক্ষা করার জন্য যেমন সংগঠন বা সংঘের প্রয়োজন হয়, তেমনি ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে রক্ষা ও তার স্বরাজ বজায় রাখতেও সেরূপ সংঘ গড়ে তোলা প্রয়োজন। সংস্কৃতির অনুশীলন এবং লালনকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যরূপে নির্ধারণ করা হোক এসব সংঘগুলোর দর্শন। আর এই সত্যটা আমাদের সকলের উপলব্ধি করা উচিত। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ, বর্তমান আলোচনা শুধু এর একটি ক্ষুদ্র অংশের প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সহায়ক তথ্য নির্দেশিকা

আফসারউদ্দীন, মুহাম্মদ (সম্পাদিত), *এ. কে. নাজমুল করিম স্মারক গ্রন্থ,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ১৯৮৪

আহসান, সৈয়দ আলী, *আমাদের সংস্কৃতি, দৈনিক বাংলা,* ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৮৯

ইসলাম, মুস্তফা নুরুল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশঃ বাঙ্গালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে,* ঢাকা সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০

ওয়াইজ, জেমস, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি বর্ণ ও পেশার বিবরণ,* ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯৮

খান, শামসুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য,* ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

চৌধুরি, আনোয়ার উল্লাহ (এবং অন্যান্য), *সমাজ বিজ্ঞান শব্দকোষ,* ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

মহাপাত্র, অনাদিকুমার, *বিষয় সমাজতত্ত্ব,* কলিকাতা ইন্ডিয়ান বুক কনসার্ন, ২০০০

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি,* ঢাকা হাসান বুক হাউজ, ১৯৮৮

রায়, অজয়, *বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী,* ঢাকা খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

সামাদ, এবনে গোলাম, *নৃতত্ত্ব,* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২

সুর, অতুল, *বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর বিবর্তন,* কলকাতাঃ সাহিত্যলোক, ১৯৯৪

সেন, রংগলাল, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস,* ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭

হাফিজ, আব্দুল, *বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য,* ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫

Hellman, C.G. ***Culture, Health and Illness,*** Oxford: Butterworth-Heinemann ltd., 1990

Macivar, RM & Page, CH, ***Society***, London: Macmillan & Co., 1959

Patwari, Mafizul Islam, A.B.M (edt.), ***Human Rights in Contemporary International Law***, Dhaka: Humanist and Ethical Association of Bangladesh, 1995